# অনধিকার প্রবেশ

শ্রাবণ, ১৩০১

একদা প্রাতঃকালে পথের ধারে দাঁড়াইয়া এক বালক আর-এক বালকের সহিত একটি অসমসাহসিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বাজি রাখিয়াছিল। ঠাকুরবাড়ির মাধবীবিতান হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে পারিবে কি না, ইহাই লইয়া তর্ক। একটি বালক বলিল 'পারিব', আর-একটি বালক বলিল 'কখনোই পারিবে না'।

কাজটি শুনিতে সহজ অথচ করিতে কেন সহজ নহে তাহার বৃত্তান্ত আর-একটু বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক।

পরলোকগত মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির বিধবা স্ত্রী জয়কালী দেবী এই রাধানাথ জীউর মন্দিরের অধিকারিণী। অধ্যাপক মহাশয় টোলে যে তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন পত্নীর নিকটে একদিনের জন্যও সে উপাধি সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে উপাধির সার্থকতা ঘটিয়াছিল, কারণ, তর্ক এবং বাক্য সমস্তই তাঁহার পত্নীর অংশে পড়িয়াছিল, তিনি পতিরূপে তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিয়াছিলেন।

সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে জয়কালী অধিক কথা কহিতেন না কিন্তু অনেক সময় দুটি কথায়, এমন-কি, নীরবে অতি বড়ো প্রবল মুখবেগও বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন।

জয়কালী দীর্ঘাকার দৃঢ়শরীর তীক্ষ্ণনাসা প্রখরবুদ্ধি স্ত্রীলোক। তাঁহার স্বামী বর্তমানে তাঁহাদের দেবোত্তর সম্পত্তি নষ্ট হইবার জো হইয়াছিল। বিধবা তাঁহার সমস্ত বাকি বকেয়া আদায়, সীমাসরহদ্দ স্থির এবং বহুকালের বেদখল উদ্ধার করিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাপ্য হইতে কেহ তাহাকে এক কড়ি বঞ্চিত করিতে পারিত না।

এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌরুষের অংশ থাকাতে তাঁহার যথার্থ সঙ্গী কেহ ছিল না। স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে ভয় করিত। পরনিন্দা, ছোটো কথা বা নাকি কান্না তাঁহার অসহ্য ছিল। পুরুষেরাও তাঁহাকে ভয় করিত ; কারণ, পল্লীবাসী ভদ্রপুরুষদের চণ্ডীমণ্ডপগত অগাধ আলস্যকে তিনি একপ্রকার নীরব ঘৃণাপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষের দ্বারা ধিক্কার করিয়া যাইতে পারিতেন যাহা তাহাদের স্থূল জড়ত্ব ভেদ করিয়াও অন্তরে প্রবেশ করিত।

প্রবলরূপে ঘৃণা করিবার এবং সে ঘৃণা প্রবলরূপে প্রকাশ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই প্রৌঢ়া বিধবাটির ছিল। বিচারে যাহাকে অপরাধী করিতেন তাহাকে তিনি কথায় এবং বিনা কথায়, ভাবে এবং ভঙ্গিতে একেবারে দগ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন।

পল্লীর সমস্ত ক্রিয়াকর্মে বিপদে সম্পদে তাঁহার নিরলস হস্ত ছিল। সর্বত্রই তিনি নিজের একটি গৌরবের স্থান বিনা চেষ্টায় অতি সহজেই অধিকার করিয়া লইতেন। যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন সেখানে তিনিই যে সকলের প্রধানপদে, সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অথবা উপস্থিত কোনো ব্যক্তির মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না।

রোগীর সেবায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কিন্তু রোগী তাঁহাকে যমেরই মতো ভয় করিত। পথ্য বা নিয়মের লেশমাত্র লঙ্ঘন হইলে তাঁহার ক্রোধানল রোগের তাপ অপেক্ষা রোগীকে অধিক উত্তপ্ত করিয়া তুলিত।

এই দীর্ঘাকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার কঠোর নিয়মদণ্ডের ন্যায় পল্লীর মস্তকের উপর উদ্যত ছিলেন ; কেহ তাঁহাকে ভালোবাসিতে অথবা অবহেলা করিতে সাহস করিত না। পল্লীর সকলের সঙ্গেই তাহার যোগ ছিল অথচ তাহার মতো অত্যন্ত একাকিনী কেহ ছিল না।

বিধবা নিঃসন্তান ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার গৃহে মানুষ হইত। পুরুষ অভিভাবক অভাবে তাহাদের যে কোনো প্রকার শাসন ছিল না এবং স্নেহান্ধ পিসিমার আদরে তাহারা যে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল এমন কথা বলিতে পারিত না। তাহাদের মধ্যে বড়োটির বয়স আঠারো হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহার বিবাহের প্রস্তাবও আসিত এবং পরিণয়বন্ধন সম্বন্ধে বালকটির চিত্তও উদাসীন ছিল না। কিন্তু পিসিমা তাহার সেই সুখবাসনায় একদিনের জন্যও প্রশ্রয় দেন নাই। অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় কিশোর নবদম্পতির নব প্রেমোদ্‌গমদৃশ্য তাঁহার কল্পনায় অত্যন্ত উপভোগ্য মনোরম বলিয়া প্রতীত হইত না। বরং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিবাহ করিয়া অন্য ভদ্র গৃহস্থের ন্যায় আলস্যভরে ঘরে বসিয়া পত্নীর আদরে প্রতিদিন স্ফীত হইতে থাকিবে, এ সম্ভাবনা তাঁহার নিকট নিরতিশয় হেয় বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি কঠিন ভাবে বলিতেন, পুলিন আগে উপার্জন করিতে আরম্ভ করুক, তার পরে বধূ ঘরে আনিবে। পিসিমার মুখের সেই কঠোর বাক্যে প্রতিবেশিনীদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

ঠাকুরবাড়িটি জয়কালীর সর্বাপেক্ষা যত্নের ধন ছিল। ঠাকুরের শয়ন বসন স্নানাহারের তিলমাত্র ত্রুটি হইতে পারিত না। পূজক ব্রাহ্মণ দুটি দেবতার অপেক্ষা এই একটি মানবীকে অনেক বেশি ভয় করিত। পূর্বে এক সময় ছিল যখন দেবতার বরাদ্দ দেবতা পুরা পাইতেন না। কারণ, পূজক ঠাকুরের আর-একটি পূজার প্রতিমা গোপন মন্দিরে ছিল ; তাহার নাম ছিল নিস্তারিণী। গোপনে ঘৃত দুগ্ধ ছানা ময়দার নৈবেদ্য স্বর্গে নরকে ভাগাভাগি হইয়া যাইত। কিন্তু আজকাল জয়কালীর শাসনে পূজার যোলো-আনা অংশই ঠাকুরের ভোগে আসিতেছে, উপদেবতাগণকে অন্যত্র জীবিকার অন্য উপায় অন্বেষণ করিতে হইয়াছে।

বিধবার যত্নে ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার তক্‌তক্ করিতেছে-- কোথাও একটি তৃণমাত্র নাই। একপার্শ্বে মঞ্চ অবলম্বন করিয়া মাধবীলতা উঠিয়াছে, তাহার শুষ্কপত্র পড়িবামাত্র জয়কালী তাহা তুলিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। ঠাকুরবাড়িতে পারিপাট্য পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইলে বিধবা তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়ার ছেলেরা পূর্বে লুকাচুরি খেলা উপলক্ষে এই প্রাঙ্গণের প্রান্তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং মধ্যে মধ্যে পাড়ার ছাগশিশু আসিয়া মাধবীলতার বল্কলাংশ কিছু কিছু ভক্ষণ করিয়া যাইত। এখন আর সে সুযোগ নাই। পর্বকাল ব্যতীত অন্য দিকে ছেলেরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না এবং ক্ষুধাতুর ছাগশিশুকে দণ্ডাঘাত খাইয়াই দ্বারের নিকট হইতে তারস্বরে আপন অজ-জননীকে আহ্বান করিতে করিতে ফিরিতে হইত।

অনাচারী ব্যক্তি পরমাত্মীয় হইলেও দেবালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না। জয়কালীর একটি যবনকরপক্ব-কুক্কুটমাংস-লোলুপ ভগিনীপতি আত্মীয়সন্দর্শন উপলক্ষে গ্রামে উপস্থিত হইয়া মন্দির-

অঙ্গনে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, জয়কালী তাহাতে ত্বরিত ও তীব্র আপত্তি প্রকাশ করাতে সহোদরা ভগিনীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। এই দেবালয় সম্বন্ধে বিধবার এতই অতিরিক্ত অনাবশ্যক সতর্কতা ছিল যে, সাধারণের নিকট তাহা অনেকটা বাতুলতারূপে প্রতীয়মান হইত।

জয়কালী আর-সর্বত্রই কঠিন উন্নত স্বতন্ত্র, কেবল এই মন্দিরের সম্মুখে তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহটির নিকট তিনি একান্তরূপে জননী, পত্নী, দাসী-- ইহার কাছে তিনি সতর্ক, সুকোমল, সুন্দর এবং সম্পূর্ণ অবনম্র। এই প্রস্তরের মন্দির এবং প্রস্তরের মূর্তিটি তাঁহার নিগূঢ় নারীস্বভাবের একমাত্র চরিতার্থতার বিষয় ছিল। ইহাই তাঁহার স্বামী, পুত্র, তাঁহার সমস্ত সংসার।

ইহা হইতেই পাঠকেরা বুঝিবেন, যে-বালকটি মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে মাধবীমঞ্জরী আহরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহার সাহসের সীমা ছিল না। সে জয়কালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নলিন। সে তাহার পিসিমাকে ভালো করিয়াই জানিত, তথাপি তাহার দুর্দান্ত প্রকৃতি শাসনের বশ হয় নাই। যেখানে বিপদ সেখানেই তাহার একটা আকর্ষণ ছিল, এবং যেখানে শাসন সেখানেই লঙ্ঘন করিবার জন্য তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকিত। জনশ্রুতি আছে, বাল্যকালে তাহার পিসিমার স্বভাবটিও এইরূপ ছিল।

জয়কালী তখন মাতৃস্নেহমিশ্রিত ভক্তির সহিত ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দালানে বসিয়া একমনে মালা জপিতেছিলেন।

বালকটি নিঃশব্দপদে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মাধবীতলায় দাঁড়াইল। দেখিল, নিম্নশাখার ফুলগুলি পূজার জন্য নিঃশেষিত হইয়াছে। তখন অতি ধীরে ধীরে সাবধানে মঞ্চে আরোহণ করিল। উচ্চশাখায় দুটি-একটি বিকচোন্মুখ কুঁড়ি দেখিয়া যেমন সে শরীর এবং বাহু প্রসারিত করিয়া তুলিতে যাইবে অমনি সেই প্রবল চেষ্টার ভরে জীর্ণ মঞ্চ সশব্দে ভাঙিয়া পড়িল। আশ্রিত লতা এবং বালক একত্রে ভূমিসাৎ হইল।

জয়কালী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রটির কীর্তি দেখিলেন, সবলে বাহু ধরিয়া তাহাকে মাটি হইতে তুলিলেন। আঘাত তাহার যথেষ্ট লাগিয়াছিল, কিন্তু সে আঘাতকে শাস্তি বলা যায় না, কারণ, তাহা অজ্ঞান জড়ের আঘাত। সেইজন্য পতিত বালকের ব্যথিত দেহে জয়কালীর সজ্ঞান শাস্তি মুহুর্মুহু সবলে বর্ষিত হইতে লাগিল। বালক একবিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া নীরবে সহ্য করিল। তখন তাহার পিসিমা তাহাকে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রুদ্ধ করিলেন। তাহার সেদিনকার বৈকালিক আহার নিষিদ্ধ হইল।

আহার বন্ধ হইল শুনিয়া দাসী মোক্ষদা কাতরকণ্ঠে ছলছলনেত্রে বালককে ক্ষমা করিতে অনুনয় করিল। জয়কালীর হৃদয় গলিল না। ঠাকুরানীর অজ্ঞাতসারে গোপনে ক্ষুধিত বালককে কেহ যে খাদ্য দিবে, বাড়িতে এমন দুঃসাহসিক কেহ ছিল না।

বিধবা মঞ্চসংস্কারের জন্য লোক ডাকিতে পাঠাইয়া পুনর্বার মালাহস্তে দালানে আসিয়া বসিলেন। মোক্ষদা কিছুক্ষণ পরে সভয়ে নিকটে আসিয়া কহিল, "ঠাকুরমা, কাকাবাবু ক্ষুধায় কাঁদিতেছেন, তাঁহাকে কিছু দুধ আনিয়া দিব কি ?"

জয়কালী অবিচলিত মুখে কহিলেন, "না।" মোক্ষদা ফিরিয়া গেল। অদূরবর্তী কুটিরের কক্ষ হইতে

নলিনের করুণ ক্রন্দন ক্রমে ক্রোধের গর্জনে পরিণত হইয়া উঠিল-- অবশেষে অনেকক্ষণ পরে তাহার কাতরতার শ্রান্ত উচ্ছ্বাস থাকিয়া থাকিয়া জপনিরতা পিসিমার কানে আসিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল।

নলিনের আর্তকণ্ঠ যখন পরিশ্রান্ত ও মৌনপ্রায় হইয়া আসিয়াছে এমন সময় আর-একটি জীবের ভীত কাতরধ্বনি নিকটে ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে ধাবমান মনুষ্যের দূরবর্তী চীৎকারশব্দ মিশ্রিত হইয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ পথে একটা তুমুল কলরব উত্থিত হইল।

সহসা প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পদশব্দ শোনা গেল। জয়কালী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, ভূপর্যস্ত মাধবীলতা আন্দোলিত হইতেছে।

সরোষকণ্ঠে ডাকিলেন, "নলিন !"

কেহ উত্তর দিল না। বুঝিলেন, অবাধ্য নলিন বন্দীশালা হইতে কোনোক্রমে পলায়ন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে রাগাইতে আসিয়াছে।

তখন অত্যন্ত কঠিনভাবে অধরের উপরে ওষ্ঠ চাপিয়া বিধবা প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন।

লতাকুঞ্জের নিকট পুনরায় ডাকিলেন, "নলিন !"

উত্তর পাইলেন না। শাখা তুলিয়া দেখিলেন, একটা অত্যন্ত মলিন শূকর প্রাণভয়ে ঘন পল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

যে লতাবিতান এই ইষ্টকপ্রাচীরের মধ্যে বৃন্দাবিপিনের সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ, যাহার বিকশিত কুসুমমঞ্জরীর সৌরভ গোপীবৃন্দের সুগন্ধি নিশ্বাস স্মরণ করাইয়া দেয় এবং কালিন্দীতীরবর্তী সুখবিহারের সৌন্দর্যস্বপ্ন জাগ্রত করিয়া তোলে-- বিধবার সেই প্রাণাধিক যত্নের সুপবিত্র নন্দনভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল।

পূজারি ব্রাহ্মণ লাঠি হস্তে তাড়া করিয়া আসিল।

জয়কালী তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং দ্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অনতিকাল পরেই সুরাপানে-উন্মত্ত ডোমের দল মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশুর জন্য চীৎকার করিতে লাগিল।

জয়কালী রুদ্ধদ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "যা বেটারা, ফিরে যা ! আমার মন্দির অপবিত্র করিস্ নে !"

ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরানী যে তাঁহার রাধানাথ জীউর মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দিবেন, ইহা তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজনামধারী অতি ক্ষুদ্র দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।